ইউনিট ১ ভাষা ও মাতৃভাষা

ভূমিকা

'আকাশ ভরা চন্দ্র তারা, বিশ্বভরা প্রাণ'। কবির কথার সূত্র ধরে আমরা ভাষার আলোচনা শুরু করছি। যাদের প্রাণ আছে মানুষ তাদের মধ্যে সবার শ্রেষ্ঠ। কেন বলতে পারেন? মানুষের বুদ্ধি ও বিচার-ক্ষমতা আছে, আর আছে ভাষা। ভাষাই মানুষকে পৃথিবীতে গৌরবের আসন দান করেছে। ভাষা কবে সৃষ্টি হয়েছে কেউ তা বলতে পারে না। আদিম মানুষেরা হয়ত আকারে ইঙ্গিতে ও অস্ফুট ধ্বনির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করত। তারপর ক্রমে ক্রমে তাদের কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসা সেই অস্ফুট ধ্বনি অর্থবহ হয়েছে। তখন থেকে বলা যায় ভাষা হয়েছে ভাব প্রকাশের বাহন। তারপর কেটে গেছে হাজার হাজার বছর।

আমরা জানি যে, মানুষের ভাষা তার অস্তিত্বের অংশ। জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ভাষা অপরিহার্য। তাই আমরা বলতে পারি যে, প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ ভাব প্রকাশের সংকেত ধ্বনিকে নানা রূপ দিয়ে ভাষা সৃষ্টি করেছে। বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনির বিচিত্র সমষ্টিই ভাষা।

পৃথিবীতে যেমন বহু সংখ্যক মানুষ, ভাষাও তেমনি অজস্র। প্রত্যেকটি ভাষার স্রষ্টা এক একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশে এক একটি বিশেষ ভাষা লালিত হয়। সাধারণভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহার করে। আর সেই ভাষাটিই তার মাতৃভাষার সম্মান পায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের সব সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা বা বিকশিত করা। মানসিক প্রক্রিয়া ও প্রকাশের বাহন হিসেবে ভাষা শিক্ষা সব শিক্ষার ভিত্তি। এই ইউনিটে আমরা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক উপাদান এবং বাংলা ভাষারীতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য ইউনিটকে আমরা পাঁচটি পাঠে ভাগ করেছি। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ১.১: ভাষা: ভাষার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক উপাদান
পাঠ- ১.২: ধ্বনি ও বর্ণ
পাঠ- ১.৩: শব্দ
পাঠ- ১.৪: বাক্য
পাঠ- ১.৫: বাংলা ভাষারীতি: সাধু-চলিত

পাঠ ১.১

ভাষা: ভাষার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক উপাদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি—

- ভাষার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ভাষার মৌলিক উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাগয্ন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম বলতে পারবেন।

fvlv

মানুষের মনের ভাব ও ভাবনার বাহন ভাষা। ভাষা ছাড়া আপনি কখনও আপনার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারেন না। মানুষ এক বা একাধিক ধ্বনির মাধ্যমে এক একটি ভাব প্রকাশ করে। এই ধ্বনি মানুষের কণ্ঠ থেকেই বের হয়। মানুষের কণ্ঠ থেকে বের হওয়া অর্থপূর্ণ ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা। এই ধ্বনি মানুষের এক অমূল্য সম্পদ। এইসব ধ্বনি ফুসফুস থেকে বের হয়ে মুখের ভিতরের বিভিন্ন অংশ, যেমন- কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়। মুখের ভিতরের এইসব প্রত্যঙ্গের সমবায়ে গঠিত হয়েছে বাগ্যন্ত্র। প্রকৃতিপ্রাপ্ত বাগ্যন্ত্র থেকে উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা। মানব সমাজের বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী এক একটি ভাষার স্রষ্টা। এখন আপনি ভাষার সংজ্ঞা কী হতে পারে একটু ভাবুন। এবার আপনার সংজ্ঞার সঙ্গে নিচের সংজ্ঞাটি মিলিয়ে নিন।

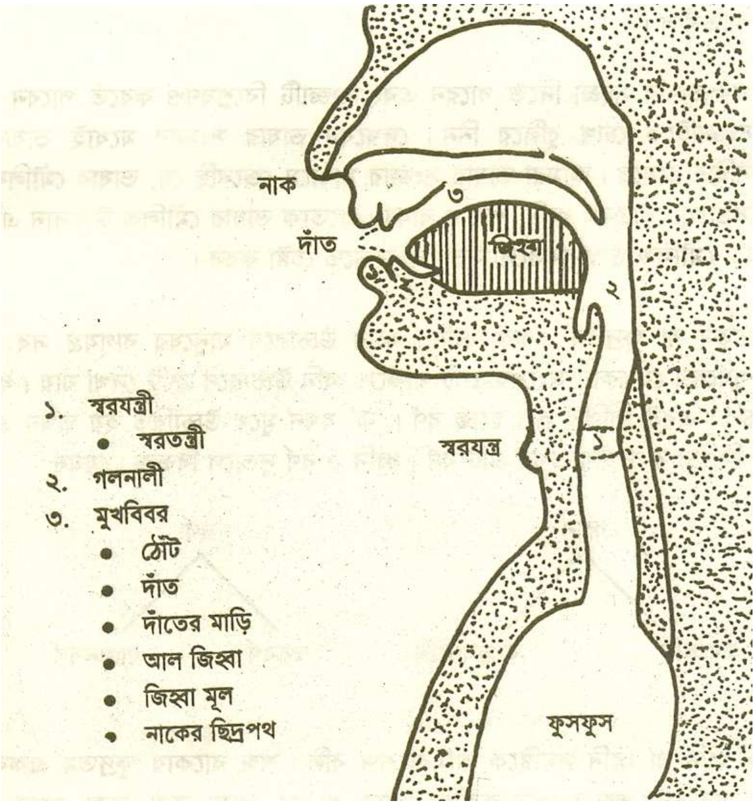

চিত্র- ১: বাগযন্ত্র।

ভাষার সংজ্ঞা

“মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, ধ্বনি দ্বারা সম্পাদিত, বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টির নাম ভাষা।”

এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই:

- ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে;
- ভাষা বাগ্‌যন্ত্র থেকে উচ্চারিত হয়;
- এক এক সমাজে এক এক ভাষা ব্যবহৃত হয়;
- ভাষা মূলত বাক্যে প্রযুক্ত অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টি।

ভাষার বৈশিষ্ট্য

– কতগুলো মৌলিক উপাদান দিয়ে ভাষা গঠিত। সেগুলো হল- ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য।

– ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ ধ্বনি। ভাষা ধ্বনি সমষ্টির সাহায্যে বিষয়কে পরিস্ফুট করে।

– ভাষার প্রত্যেকটি শব্দ এক একটি বস্তু বা ভাবের প্রতীক।

– ভাষার মূল ভিত্তি বাক্য। বাক্যের মাধ্যমে মানুষ একের মনোভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করে।

– বাক্য গঠনের দিক থেকে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পার্থক্য বিদ্যমান।

– মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের গঠন-বৈশিষ্ট্য ভাষা সৃষ্টির সহায়ক।

– ভাষা পরিবর্তনশীল।

– ভাষা গতিশীল।

ভাষার মৌলিক উপাদান

আপনি এখন ভাষার সংজ্ঞা দিতে পারেন এবং সংজ্ঞাটি বিশে- ষণও করতে পারেন। তবু আর একবার সংজ্ঞাটিতে চোখ বুলিয়ে নিন। দেখবেন ভাষার সংজ্ঞার মধ্যেই ভাষার মৌলিক উপাদান নিহিত রয়েছে। আমরা ভাষার সংজ্ঞার মাধ্যমে জেনেছি যে, ভাষার মৌলিক উপাদান তিনটি। সেগুলো যথাক্রমে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য। প্রত্যেক ভাষার মৌলিক উপাদান এই তিনটি। এখন আমরা মৌলিক উপাদানগুলো সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।

ধ্বনি

ভাষার ন্যূনতম বা ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। ধ্বনি উচ্চারণে মানুষের বাগ্‌যন্ত্র সব সময় ব্যস্ত থাকে। বাগ্‌যন্ত্রের যে কোন অংশের ত্রুটি থাকলে ধ্বনি উচ্চারণে ত্রুটি দেখা যায়। ধ্বনি ভাষার মৌখিক রূপ। এরই লিখিত রূপ হচ্ছে বর্ণ। ‘ক’ যখন মুখে উচ্চারিত হয় তখন এটি ধ্বনি। আর যখন লিখিত রূপ পায় তখন এটি বর্ণ। ধ্বনি ও বর্ণ দুভাগে বিভক্ত। যেমন-

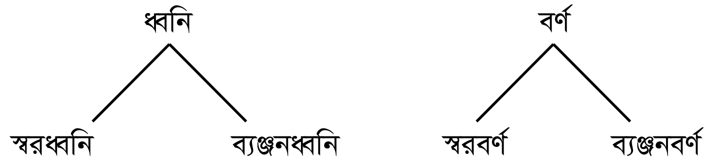

শব্দ

অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে আমরা শব্দ বলি। শব্দ বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক। আমরা কথাবার্তায় সব সময় শব্দ ব্যবহার করছি। যেমন -যাওয়া, আসা, করা, লতা, পাতা, ফুল, ফল, নদী, বাতাস, সাগর। তাই মনে হয়, আমরা যেন শব্দের সাগরে ডুবে আছি। শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে পদ বলে। যেমন, 'আমার সোনার হরিণ চাই'- এ বাক্যে 'আমার', 'সোনার', 'হরিণ', 'চাই'-এগুলো এক একটি পদ।

বাক্য

এবার তাহলে বাক্য কী তা আমরা জানতে চেষ্টা করি। আমরা জানি, 'এক বা একাধিক শব্দ মিলে যখন মনের ভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্য বলে।' যেমন- দাঁড়াও। যেওনা। ওই একটা পাখি। আমার কথা শোনো। 'এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার।'

উপরের সবগুলোই এক একটি বাক্য। এগুলো আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাক্যগুলো কতগুলো শব্দের সমষ্টি। শব্দগুলো সাজানো হয়েছে নানা ভাবে। সেই জন্যই এক একটা বাক্য এক এক রকম ভাব প্রকাশ করছে।

এই পাঠে আমরা শিখলাম-

- ভাষার স্বরূপ বা ভাষা কাকে বলে।
- ভাষার বৈশিষ্ট্যাবলী।
- ভাষার মৌলিক উপাদানসমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

উদাহরণ

আদিম যুগে মানুষ কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করত?

ক. বস্তুর সাহায্যে　　খ. ইশারার মাধ্যমে
গ. কথা বলে　　ঘ. অস্ফুট ধ্বনি ও ইশারায়।

১. ভাবের আদান-প্রদানের প্রধান মাধ্যম কোন্‌টি?
ক. কবিতা　　খ. ভাষা
গ. চিঠি　　ঘ. উপহার।

২. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কী?
ক. ধ্বনি　　খ. বর্ণ
গ. শব্দ　　ঘ. বানান।

৩. ভাষার মূল উপাদান কয়টি?
ক. দুটি　　খ. তিনটি
গ. চারটি　　ঘ. পাঁচটি।

৪. ভাষার ন্যূনতম একক কী?
ক. ধ্বনি　　খ. শব্দ
গ. পদ　　ঘ. বাক্য।

৫. অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে কি বলা হয়?
ক. বাক্য　　খ. সমাস
গ. সন্ধি　　ঘ. শব্দ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. ভাষা বলতে কী বুঝেন?
খ. মাতৃভাষা কাকে বলে?
গ. ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কী?
ঘ. পদ কাকে বলে?
ঙ. বাক্য কাকে বলে?

পাঠ ১.২

ধ্বনি ও বর্ণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি—

- ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন;
- স্বরবর্ণের পরিচয় দিতে পারবেন;
- উচ্চারণ স্থানের ভিত্তিতে ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয় দিতে পারবেন এবং
- ব্যঞ্জনবর্ণগুলো বিভিন্নভাবে ভাগ করতে পারবেন।

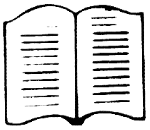

বর্ণ

আমরা পাঠ- ১ থেকে জেনেছি যে ভাষার ন্যূনতম একক ধ্বনি। আপনি যখন কথা বলেন বা আপনার সঙ্গে কেউ কথা বলে, তখন উচ্চারিত শব্দকে সূক্ষ্মভাবে ভাগ করলে কতগুলো ধ্বনি শুনতে পাবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে ধ্বনি মানুষের মুখে উচ্চারিত হয় এবং তা কানে শোনা যায় ও সমষ্টিগতভাবে তার অর্থ বোঝা যায়। ধ্বনি উচ্চারণ করেই মানুষ থেমে থাকেনি। শুধু কাছের মানুষ নয়, বরং দূরের মানুষকে বা অনাগত কাউকে জানাবার জন্য ধ্বনির স্থায়িত্ব সে দিতে চেয়েছে। তাই এসেছে প্রতীক। প্রথম অবস্থায় মানুষ ছবি এঁকে এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। সেটা বেশী কঠিন কাজ। ক্রমে মানুষ ধ্বনির একটা করে প্রতীক বা চিহ্ন দিতে শিখল। ধ্বনির এই প্রতীক বা চিহ্নকেই বলা হয় বর্ণ।

আমরা জানি বর্ণের উচ্চারিত রূপ ধ্বনি আর ধ্বনির লিখিত রূপ বর্ণ। এই বর্ণগুলোকে একত্রে বলা হয় বর্ণমালা। বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশটি বর্ণ আছে। এই বর্ণগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

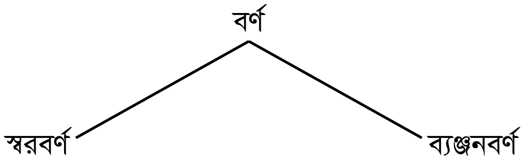

স্বরবর্ণ

যে সব বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হয়, সে সব বর্ণকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ মোট এগারটি। যথা-

অ আ ই ঈ
উ ঊ ঋ
এ ঐ ও ঔ

আপনি এখন বর্ণগুলোকে উচ্চারণ করেন। দেখবেন অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই বর্ণগুলো স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। স্বরবর্ণ দুপ্রকার। যথা-হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর।

যে সকল স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে অল্প সময় লাগে, সে সকল স্বরবর্ণকে হ্রস্বস্বর বলা হয়। যেমন- অ ই উ ঋ

যে সকল স্বরধ্বনি উচ্চারণে বেশি সময় লাগে, সে সকল স্বরধ্বনিকে দীর্ঘস্বর বলে। যেমন-

আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় কার এবং তা বিশেষ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তবে 'অ' কারের সংক্ষিপ্ত রূপ বা কার চিহ্ন নেই। অন্যান্য বর্ণের আছে। যেমন-

আ	এর সংক্ষিপ্ত রূপ	া
ই	,,	ি
ঈ	,,	ী
উ	,,	ু
ঊ	,,	ূ
ঋ	,,	ৃ
এ	,,	ে
ঐ	,,	ৈ
ও	,,	ো
ঔ	,,	ৌ

ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সব বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, সে সব বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হওয়ার সময় মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত বা ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয়। এ বর্ণগুলো পরনির্ভর বর্ণ। অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরবর্ণের সাহায্য লাগে। বাংলায় মোট ঊনচলি- শটি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে। যথা-

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়
ৎ	ং	ঃ	ঁ	

স্পর্শবর্ণ

আপনি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো উচ্চারণ করেন। দেখবেন স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া এগুলো উচ্চারিত হচ্ছে না। যেমন, ক্+অ=ক, খ্+অ=খ ইত্যাদি।

'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্র, মধ্য বা মূল ভাগ মুখের ভেতরের বিভিন্ন অংশে এবং ঠোঁটে ঠোঁটে স্পর্শ করে বলে এদের স্পর্শবর্ণ বলে। স্পর্শবর্ণগুলোকে পাঁচভাবে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলোকে বলা হয় বর্গ। প্রতি বর্গে পাঁচটি করে বর্ণ আছে। প্রতিটি বর্গের প্রথম অক্ষর দিয়ে বর্গের নামকরণ করা হয়েছে। উচ্চারণ স্থানের ভিত্তিতে এখানে বর্ণগুলোর পরিচয় দেয়া হল:

ক বর্গ- ক খ গ ঘ ঙ- জিহ্বামূলীয় ধ্বনি
চ বর্গ- চ ছ জ ঝ ঞ- তালব্য ধ্বনি
ট বর্গ- ট ঠ ড ঢ ণ- মূর্ধন্য ধ্বনি
ত বর্গ- ত থ দ ধ ন- দন্ত্য ধ্বনি
প বর্গ- প ফ ব ভ ম- ওষ্ঠ্য ধ্বনি

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে বর্গে ভাগ করা ছাড়াও বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে। যেমন- অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, অঘোষ, ঘোষ, নাসিক্য, উষ্ম, অন্তঃস্থ, তাড়নজাত, পরাশ্রয়ী ইত্যাদি। আপনি এখন সংজ্ঞার সাথে প্রত্যেকটা বর্ণ উচ্চারণ করে করে মিলিয়ে নিন। যেমন-

অল্পপ্রাণ

বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনির উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ কম থাকে বলে এ ধ্বনিগুলোকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন- ক, গ; চ, জ; ট, ড; ত, দ; প, ব।

মহাপ্রাণ

বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনির উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ বেশি থাকে বলে এ বর্ণগুলোকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন- খ, ঘ; ছ, ঝ; ঠ, ঢ; থ, ধ; ফ, ভ।

অঘোষ

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরনিত হয় না বলে এগুলোকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন- ক, খ; চ, ছ; ট, ঠ; ত, থ; প, ফ।

ঘোষ

বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় বলে এগুলোকে ঘোষধ্বনি বলে। যেমন- গ, ঘ; জ, ঝ; ড, ঢ; দ, ধ; ব, ভ।

নাসিক্য

বর্গের পঞ্চম ধ্বনি যেমন- ঙ, ঞ, ণ, ন, ম উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাসবায়ু আংশিকভাবে নাসিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এগুলোকে নাসিক্য ধ্বনি বলে। অনুস্বর (ং) এবং চন্দ্রবিন্দু (ঁ) এ পর্যায়ে পড়ে।

উষ্ম

শ, ষ, স ও হ- এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করবার সময় নিঃশ্বাসবায়ুকে শিসধ্বনির মত প্রবাহিত করতে হয় বলে এগুলোকে উষ্মধ্বনি বলা হয়।

অন্তঃস্থ

স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির অন্তবর্তী য, র, ল, ব- এই চারটি ধ্বনিকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলে।

তাড়নজাত

ড়, ঢ় ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগের উল্টো পিঠ দিয়ে উপরের দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারণ করতে হয়। এজন্য এগুলোকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। যেমন: পীড়া, বড়, মূঢ়, গাঢ় ইত্যাদি।

পরাশ্রয়ী

ং, ঃ, ঁ - এ ধ্বনিগুলো স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়। এজন্য এগুলোকে পরাশ্রয়ী ধ্বনি বলা হয়। যেমন: সংঘ, দুঃখ, চাঁদ।

এই পাঠে আমরা শিখলাম-

- ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য
- স্বরধ্বনির পরিচয়
- ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয়

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. ধ্বনির স্থায়িত্বের জন্য কী এসেছে?
ক. প্রতীক
খ. শব্দ
গ. পদ
ঘ. বাক্য।

২. বর্ণমালায় মোট কয়টি বর্ণ আছে?
ক. ৩৭টি
খ. ৪৫টি
গ. ৪৮টি
ঘ. ৫০টি।

৩. কোন্ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই?
ক. অ
খ. ই
গ. এ
ঘ. ঐ।

৪. পরাশ্রয়ী বর্ণ কোনগুলো?
ক. শ, ষ, স
খ. হ, ড়, ঢ়
গ. ং, ঃ, ঁ
ঘ. ব, র, ল।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বর্ণ কাকে বলে? বর্ণগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কী কী?
২. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ লিখুন।

টীকা লিখুন

অল্পপ্রাণ ধ্বনি, মহাপ্রাণ ধ্বনি, অঘোষ ধ্বনি, ঘোষ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, উষ্ম ধ্বনি, অন্তঃস্থ ধ্বনি, তাড়নজাত ধ্বনি, পরাশ্রয়ী বর্ণ।

পাঠ ১.৩

শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- শব্দের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- উৎপত্তি অনুসারে শব্দের পরিচয় দিতে পারবেন;
- গঠন অনুসারে শব্দ বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- অর্থানুসারে শব্দ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

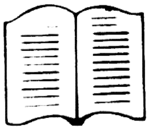

আপনি আপনার চারপাশে নানা রকমের জিনিস, বস্তু ও প্রাণী দেখতে পাচ্ছেন। যেমন, আকাশ, বাতাস, হাঁড়ি, পাতিল, থালা, গ্লাস, ফুল, ফল, পাতা, পশু, পাখি, ইট, কাঠ, বাঁশ, বেত, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী -আরো কত কী? এগুলো এক একটি শব্দ।

শব্দ

প্রত্যেকটা শব্দেরই অর্থ আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি, অর্থযুক্ত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিই শব্দ। যে ধ্বনির অর্থ নেই তাকে কিন্তু আপনি শব্দ বলতে পারবেন না। অর্থযুক্ত শব্দই ভাষার সম্পদ। শব্দের উপর ভিত্তি করেই ভাষার বিকাশ ঘটেছে। নতুন নতুন শব্দ গঠনের ক্ষমতা ও ভাষার রয়েছে।

বাংলা ভাষায় প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজারের মত শব্দ রয়েছে। এই শব্দগুলো দেশী বিদেশী অগণিত শব্দের দ্বারা সমৃদ্ধ। যে ভাষায় যত বেশি শব্দ সে ভাষা তত বেশি ধনী। এসব দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় বাংলা ভাষা শব্দ সম্ভারে খুবই সমৃদ্ধ।

উৎপত্তি অনুসারে শব্দ

উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. তৎসম
২. অর্ধ-তৎসম
৩. তদ্ভব
৪. দেশী
৫. বিদেশী।

এ শব্দগুলো সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার জানার কৌতূহল হচ্ছে। এবার আসুন, আমরা শব্দগুলোর পরিচয় জেনে নিই:

তৎসম

যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে পরিবর্তন ছাড়াই বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। বাংলায় এ ধরনের শব্দ অনেক বেশি আছে। ড. এনামুল হকের মতে বাংলা ভাষার খ্যাতনামা লেখকদের লেখায় শতকরা পঁচিশটি শব্দই তৎসম। বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, নক্ষত্র, ধর্ম, কর্ম, মূর্খ, সমুদ্র, পর্বত ইত্যাদি তৎসম শব্দের উদাহরণ।

অর্ধ-তৎসম

যে সব তৎসম শব্দ মুখে মুখে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে সে সব শব্দকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন: নেমন্তন্ন, গিন্নি, পেন্নাম, ছেরাদ্দ, গতর ইত্যাদি।

সংস্কৃত থেকে অর্ধতৎসম শব্দের রূপান্তর-

সংস্কৃত	অর্ধ-তৎসম
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন
গৃহিনী	গিন্নি
প্রণাম	পেন্নাম
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ
গাত্র	গতর

উপরের উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণে কিছুটা বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে অর্ধ-তৎসম শব্দে পরিণত হয়েছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক-এর মতে, বাংলা ভাষায় খ্যাতনামা লেখকদের লেখায় শতকরা পাঁচটি শব্দ অর্ধ-তৎসম।

তদ্ভব

যে সব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, অথচ যুগ যুগ ধরে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সে সব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে। নিচের তালিকাটি লক্ষ করুন-

সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব
হস্ত	হত্থ	হাত
কাষ্ঠ	কট্‌ঠ	কাঠ
চর্মকার	চম্মআর	চামার
ভক্ত	ভত্ত	ভাত
কার্য	কজ্জ	কাজ
প্রস্তর	পত্থর	পাথর

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দই তদ্ভব শব্দ। ড. মুহম্মদ এনামুল হক-এর মতে বাংলা ভাষায় খ্যাতনামা লেখকদের লেখায় শতকরা ষাট ভাগ শব্দই তদ্ভব শব্দ।

দেশি

এদেশে আর্য জাতির আসার পূর্বে কোল, মুন্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি জাতি বসবাস করত। এইসব মানুষের ভাষা থেকে যে সব শব্দ বাংলায় স্থান লাভ করেছে, সে সব শব্দকে দেশী শব্দ বলে। তবে এ ধরণের শব্দ বাংলা ভাষায় মাত্র শতকরা দুটি এসেছে বলে মনে করা হয়। এ ধরনের শব্দের উদাহরণ- চাউল, মুড়ি, কুলা, ঢেঁকি, খোকা, খুকি, ডাব, ঢোল, ডিঙি, ঘুড়ি, ঝাঁটা, ঝাঁকা, চুলা, খাঁদা ইত্যাদি।

বিদেশি

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের ফলে বহু আরবি, ফারসি, ফরাসি, ইংরেজি, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, তুর্কি, চীনা, জাপানি, বর্মি ইত্যাদি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। বিদেশি ভাষা থেকে আসা শব্দকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন:

আরবি- আইন, আদালত
ফারসি- আমির, উজির
ফরাসি- বিস্কুট, রেস্তোরাঁ
ইংরেজি- চেয়ার, টেবিল, স্কুল, পকেট, ফার্মেসি, ফ্যাক্টরি
পর্তুগীজ- বোতাম, আনারস
ওলন্দাজ- তুরুপ, টেক্কা
তুর্কি- বিবি, বেগম
চীনা- চা, চিনি
জাপানি- রিকসা, সামপান
বর্মি- লুঙ্গি, ঘুঘনি ইত্যাদি।

আমরা উপরে বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার উৎপত্তি অনুসারে বিশে- ষণ করেছি। মজার ব্যাপার হল শব্দগুলো যে উৎস থেকেই আসুক না কেন এগুলো এখন আমাদের নিজেদের সম্পদ। এগুলো সম্পর্কে আরও কিছু কথা আমরা জেনে নিই।

গঠনানুসারে শব্দ

দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ নানা উপায়ে গঠিত হয়েছে। গঠন অনুযায়ী শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. মৌলিক শব্দ।
২. সাধিত শব্দ।

মৌলিক শব্দ

ভাষায় ব্যবহৃত যে সব শব্দকে বিশে- ষণ করা বা ভাঙ্গা যায় না, সে সব শব্দকে মৌলিক শব্দ বলে। আপনি যদি মৌলিক শব্দকে ভাঙ্গার চেষ্টা করেন, তাহলে সেই ভাঙ্গা অংশের কোন অর্থ খুঁজে পাবেন না। কয়েকটি মৌলিক শব্দ নিয়ে আপনি ভাঙ্গার চেষ্টা করুন। দেখবেন, ভাঙ্গা অংশের কোন অর্থ হচ্ছে না। মৌলিক শব্দের উদাহরণ: মা, ভাই, হাত, পা, উট, ঘোড়া ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ

ভাষায় ব্যবহৃত যে সব শব্দকে ভাঙ্গা যায় এবং ভাঙ্গা অংশেরও অর্থ থাকে তাকে সাধিত শব্দ বলে। সাধিত শব্দ দুই প্রকার। যথা:

১. প্রত্যয় সাধিত
২. সমাস সাধিত

প্রত্যয় সাধিত শব্দের উদাহরণ:

পাঠক = √পঠ্+অক (কৃৎ প্রত্যয় যোগে)
বার্ষিক = বর্ষ+ইক (তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে)

সমাস সাধিত শব্দের উদাহরণ:

দম্পতি = জায়া ও পতি
পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা

অর্থানুসারে শব্দ

আমরা উৎপত্তি এবং গঠনানুসারে শব্দকে ভাগ করেছি। এবার আসুন, অর্থানুসারে ভাগ করি। অর্থানুসারে শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. যৌগিক শব্দ
২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ
৩. যোগরূঢ় শব্দ

যৌগিক শব্দ

যে সব শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ী হয়ে থাকে, সে সব শব্দকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন:

√কৃ+তব্য = কর্তব্য- অর্থ: যা করা উচিত
বাবু+আনা = বাবুয়ানা- অর্থ: বাবুর ভাব

আপনি উপরের শব্দগুলোর দিকে লক্ষ করুন। দেখবেন, শব্দগুলো প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ীই হয়েছে।

যে সব শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন বিশেষ অর্থ জ্ঞাপন করে, সে সব শব্দকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন: হস্তী = হস্ত+ইন- প্রকৃতি ও প্রত্যয় অনুযায়ী অর্থ: হস্ত আছে যার। কিন্তু রূঢ় বা রূঢ়ি অর্থে হস্তী বলতে আমরা সুপরিচিত বৃহদাকার প্রাণীকেই বুঝি।

উপরের উদাহরণে দেখতে পাচ্ছেন, ‘হস্তী’ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ না মেনে অন্য একটা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করছে। এই ধরণের শব্দকেই রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলা হয়।

সমাস নিষ্পন্ন যে সব শব্দ সমাসের অর্থের অনুগামী না হয়ে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, সে সব শব্দকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন: রাজপুত- ‘রাজার পুত্র’ অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে ‘জাতি বিশেষ’।

যুগে যুগে বিচিত্র ব্যবহারের ফলে এভাবে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

এই পাঠে আমরা শিখলাম-

- শব্দের ধারণা ও সংজ্ঞা
- উৎপত্তি অনুসারে শব্দের পরিচয়
- গঠন অনুসারে শব্দের বিশ্লেষণ
- অর্থ অনুসারে শব্দের বিশ্লেষণ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. বাংলা ভাষায় শব্দ সংখ্যা কত?
ক. প্রায় পঞ্চাশ হাজার
খ. প্রায় পঁচাত্তর হাজার
গ. প্রায় এক লক্ষ
ঘ. প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার।

২. উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই ভাগে
খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে
ঘ. পাঁচ ভাগে।

৩. গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ সমূহকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই ভাগে
খ. চার ভাগে
গ. পাঁচ ভাগে
ঘ. ছয় ভাগে।

৪. অর্থ অনুসারে শব্দকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই ভাগে
খ. তিন ভাগে
গ. পাঁচ ভাগে
ঘ. দশ ভাগে।

পাঠ ১.৪

বাক্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি—

- বাক্যের গুণাগুণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাক্যের অংশ বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন প্রকার বাক্যের পরিচয় দিতে পারবেন।

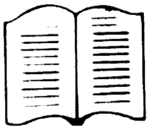

নিচের কথাগুলো পড়ি:

ও ভাই, কেমন আছেন?
এবার জামিতে ভাল ধান ফলেছে।
কাজের মাধ্যমেই জীবনের সফলতা আসে।
এ সুন্দর পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে মন চায় না।

বাক্য

আমরা জানি, এক বা একাধিক পদ মিলে যখন মনের ভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্য বলে। তাহলে উপরের সবগুলোই এক একটা বাক্য। আপনি প্রত্যেকটা বাক্যেই দেখবেন মনের ভাবটি সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। উপরের বাক্যগুলোতে দেখতে পাচ্ছি, প্রত্যেকটা বাক্যে অনেকগুলো পদ রয়েছে। তবে একই বাক্যে সবগুলো পদ (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া) থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। শুধুমাত্র একটি ক্রিয়াপদ দিয়েও বাক্য হতে পারে। যেমন:

উঠুন।
বসুন।
যান।
আসুন। ইত্যাদি।

তবে এ ধরনের বাক্যে একটি পদ উহ্য বা অনুচ্চারিত থাকে। কারণ, ‘উঠুন’ বললে ‘আপনি উঠুন’ -ই বুঝায়।

বাক্যের গুণ

আপনি একটা কথা মনে রাখবেন, পদসমষ্টি হলেই তাকে বাক্য বলা যায় না। বরং বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটা পদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকতে হবে এবং বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেতে হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা বাক্যের তিনটি গুণ বা লক্ষণ দেখতে পাই। যেমন:

১. আকাঙ্খা
২. আসত্তি
৩. যোগ্যতা

আকাঙ্খা

বাক্যের অর্থ ভালভাবে বোঝার জন্য এক পদ শোনার পর অপর পদ শোনার যে ইচ্ছা, তাকে আকাঙ্খা বলে। আমি যদি বলি, ‘আমাকে এক গ্লাস -----’ তাহলে আপনি আমার মনের ভাব

সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন না। কারণ আমি আপনার কাছে পানি চাইতে পারি, শরবত চাইতে পারি। আর সম্পূর্ণ মনের ভাব বুঝতে না পারলে তা বাক্যও হবে না। যদি বলি, 'আমাকে এক গ-াস দুধ দিন।' -তাহলে আকাঙ্খার নিবৃত্তি ঘটবে এবং তা একটি সার্থক বাক্য হবে।

আসত্তি

আসত্তি শব্দটার অর্থই হল পরস্পর নৈকট্য। অর্থাৎ একটা পদ আর একটা পদের কাছাকাছি থাকবে। আপনি যদি বলেন, 'বলব সত্যকথা সবসময় আমি।' -তাহলে পদগুলো সঠিকভাবে না সাজানোর কারণে আপনার ভাব যথার্থ প্রকাশ পায়নি। আর যদি বলেন, 'আমি সবসময় সত্য কথা বলব।' -তাহলে পদগুলো যথস্থানে সাজান হল এবং এটি একটি বাক্য হল।

যোগ্যতা

বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলো ভাবগত ও অর্থগত দিক দিয়ে মিলে গেলে তাকে যোগ্যতা বলে। আমি যদি বলি, 'আপনি আগুনে সাঁতার কাটেন এবং পানিতে রান্না করেন।' -তাহলে উক্তিটি ভাব প্রকাশে যোগ্যতা হারাবে। কারণ মানুস আগুনে সাঁতার কাটে না এবং পানিতে রান্না করে না। কিন্তু আমি যদি বলি, 'আপনি পানিতে সাঁতার কাটেন এবং আগুনে রান্না করেন, তাহলে এটি একটি সার্থক বাক্য হবে।

সঠিক বাক্য গঠনের জন্য আপনাকে অবশ্যই আকাঙ্খা, আসত্তি ও যোগ্যতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যে দুটো অংশ থাকে। যথা:

১. উদ্দেশ্য
২. বিধেয়

যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের কয়েকটা উদাহরণ:

উদ্দেশ্য	বিধেয়
চপলা	বুদ্ধিমতি মেয়ে।
আমি	উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি।
এই বইটি	চমৎকার।
অনিন্দ্য	বই পড়ে।

গঠন অনুযায়ী বাক্য

গঠনের দিক দিয়ে বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. সরল বাক্য।

২. জটিল বা মিশ্র বাক্য।

৩. যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য

যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন:

উদ্দেশ্য	বিধেয়
আমি	লিখছি।
কাঠুরে	কাঠ কাটছে।
তমাল	ভাল ছেলে।

জটিল বা মিশ্র বাক্য

যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন:

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খন্ড বাক্য
যে পরিশ্রম করে,	সেই সুখ লাভ করে।
যদিও তার টাকা আছে,	তথাপি সে দান করে না।
যখন বিপদ আসে,	তখন দুঃখও আসে।

যৌগিক বাক্য

পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়। যেমন:

তিনি আমাকে পঞ্চাশটি টাকা দিলেন এবং বই কিনতে বললেন।
তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
তিনি বিদ্বান বটে কিন্তু তাঁর কিছুমাত্র অহংকার নেই।

এই পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- সার্থক বাক্যের গুণাবলি।
- বাক্যের অংশের বিশ্লেষণ।
- বিভিন্ন প্রকার বাক্যের পরিচয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়–
ক. বর্ণে
খ. শব্দে
গ. বাক্যে
ঘ. পদে।

২. বাক্যের গুণ কয়টি?
ক. দুটি
খ. তিনটি
গ. পাঁচটি
ঘ. ছয়টি।

৩. বাক্যের অর্থ ভালভাবে বোঝার জন্য এক পদ শোনার পর আর এক পদ শোনার ইচ্ছাকে বলে–
ক. যোগ্যতা
খ. আকাঙ্খা
গ. আসত্তি
ঘ. আসক্তি।

৪. আসত্তি শব্দের অর্থ–
ক. পরস্পর নৈকট্য
খ. পরস্পর দূরত্ব
গ. পদের ভাবগত মিল
ঘ. পদের অর্থগত মিল।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উদ্দশ্য বলতে কী বুঝেন? কয়েকটি উদাহরণ দিন।
২. বিধেয় বলতে কী বুঝেন? উদাহরণ সহ লিখুন।

পাঠ ১.৫ বাংলা ভাষারীতি: সাধু ও চলিত

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- আঞ্চলিক ভাষা, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- সাধু ও চলিত ভাষারীতির ক্রমবিকাশের ধারার বর্ণনা দিতে পারবেন এবং
- সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

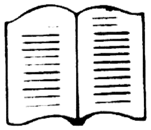

জীবন বৈচিত্র্যময়। স্থান ও কালের পটে জীবন নানা রূপে প্রকাশিত হয়। জীবনেরই সচল প্রবাহকে ধারণ করে ভাষার বিকাশ ঘটে। এই প্রবাহমানতাই ভাষার প্রাণ শক্তি।

মৌখিক ও লিখিত ভাষা

ভাষায় ব্যবহৃত রূপ দুটি: একটি মৌখিক বা কথ্য রূপ, অন্যটি লিখিত বা লেখ্য রূপ। বাংলা ভাষার মৌল বৈশিষ্ট্য মুখের কথাতেই আছে। জীবনের সব কাজে মানুষ মুখের ভাষা ব্যবহার করে। একে অপরের সঙ্গে মুখে কথা বলে, আলাপ করে বা বক্তৃতা-বিতর্ক করে। আবার টেলিফোনের মাধ্যমে দূরের মানুষের সঙ্গেও বাক্ বিনিময় করা যায়। মুখের কথা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটায়, এটা স্থায়ী নয়। তাই মুখের কথাকে লেখার মাধ্যমে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য সবার উপযোগী একটি মার্জিত রূপের প্রয়োজন মানুষ অনুভব করে। এ উদ্দেশ্যেই ভাষার লিখিত রূপের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই লেখার ভাষাকেই শিল্পরসে সমৃদ্ধ করে একদা সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য। সাহিত্যই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

আঞ্চলিক ভাষা

মানুষের মুখের ভাষার উৎস হচ্ছে তার পরিবার, পরিবেশ ও নিকট অঞ্চল। প্রথমে মানুষ আঞ্চলিক ভাষা শেখে। এক একটি বিশেষ অঞ্চলের জন সমাজ এক একটি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। প্রায় সব দেশেই অঞ্চল ভেদে ভাষার রূপভেদ দেখা যায়। একটি অঞ্চলের ভাষার সাথে অন্য অঞ্চলের ভাষার মিল কিছুটা খুঁজে পাওয়া গেলেও অমিলটাই বেশি ধরা পড়ে। বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার আঞ্চলিক ভাষার অবদান একান্তভাবে মিশে আছে। লোক সাহিত্য এবং লোক সংগীতে আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য আমরা খুঁজে পাই।

সাধু ভাষা

আঞ্চলিক ভাষার রূপভেদের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাকে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সর্বজনীন স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। এতে ভাবের আদান-প্রদান যথাযথভাবে হতে পারে না। সেই কারণে দেশের শিক্ষিত ও পন্ডিত সমাজ একটি আদর্শ ভাষার প্রচলন করেছিলেন, সেটাই সাধু ভাষা; যা বেশ কিছু কাল পূর্ব থেকে লিখিত ভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধু ভাষা কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়, এটা বাংলা ভাষার একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ।

চলিত ভাষা

আবার একই কারণে পারস্পরিক মৌখিক ভাব বিনিময়ের উপযোগী একটি আদর্শমান (Standard) ভাষা মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই তৈরি করেছে। আর সেটাই হচ্ছে চলিত ভাষা। এই চলিত ভাষাকে আমরা লিখিত ও মৌখিক উভয় রূপে ব্যবহার করে থাকি। তবে লিখিত ভাষাটি মৌখিক ভাষা থেকে একটু বেশি পরিশীলিত। তাই বলা যায়:

চলিত ভাষাও কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়। এটা বাংলা ভাষী জনগণের মৌখিক ভাব বিনিময়ের একটি আদর্শমান ভাষা। যা লিখিত রূপেও ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এই রূপটি লিখিত প্রায় সব কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

তবে চলিত বাংলা ভাষা একেবারেই আঞ্চলিক প্রভাব মুক্ত একথা বলা যায় না। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাধান্যের কারণে কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের লোকদের কথ্য ভাষার প্রভাব চলিত বাংলা ভাষার লিখিত রূপে পড়েছে। বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ নিচে দেখান হল:

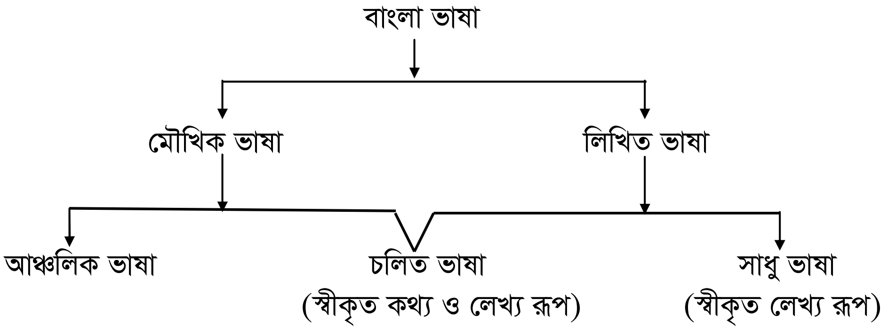

বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা থেকে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্য এবং পাঠ্যপুস্তক রচনায় মূলত সাধুরীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে চলিত রীতি ধীরে ধীরে সাধুরীতির স্থান দখল করে নিয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক চলিত রীতিতে প্রণীত হচ্ছে। শ্রেণি কক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে চলিত রীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। মাতৃভাষার শিক্ষক হিসেবে আপনিও পাঠদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই চলিত রীতি অনুসরণ করবেন। শিক্ষার্থীদের চলিত রীতির চর্চা করতে উৎসাহিত করবেন।

সাধু ও চলিত রীতির ক্রমবিকাশ

ভাষার ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে, লিখিত সাধু ভাষারীতি ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য প্রকট হতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। এর আগের গদ্য রচনার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে মৌখিক ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষার তেমন কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

সাধু ভাষার বিকাশ

১৮০০ খ্রিঃ কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। ইংরেজদের বাংলা শেখাবার প্রয়োজনে ১৮০১ খ্রিঃ এই কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। ইংরেজদের প্রয়োজনে তাদেরই প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যরীতির প্রচলন হয়– যাতে সাহিত্য সৃষ্টির স্বাভাবিক তাগিদ ছিল না। কলেজটিতে বাংলা শেখানোর জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল সংস্কৃত জানা পন্ডিতদের। তাঁদেরই উপর পড়েছিল পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার। ফলে সংস্কৃত শব্দ সম্ভারে ভরে উঠেছিল সেই সব পাঠ্যপুস্তক।

শুধু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতগণের রচনাই নয়, পরবর্তীকালের বহু লেখকের রচনায় সাধু ভাষা একটি আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্যে ভরে উঠল। এভাবে মানুষের মুখের ভাষা থেকে লেখার ভাষা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম জীবনের লেখায় পর্যন্ত সাধুরীতির ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। বর্তমানেও এর কমবেশি ব্যবহার প্রচলিত আছে।

চলিত ভাষার বিকাশ

বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রচলনের প্রথম প্রচেষ্টা চালান প্যারীচাঁদ মিত্র, 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটি রচনা করে। এটাকে সাধু ভাষারীতির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহও বলা যায়। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা চালান কালী প্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখে। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ মুজতবা আলী ও অন্যান্য আধুনিক সাহিত্যিকরা চলিত রীতিতে সাহিত্য রচনা করেন। চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা চালিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত তাঁর দলে টেনে এনেছিলেন। এর প্রতিফলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের গদ্য রচনাতে। প্রতিষ্ঠিত এই চলিত ভাষাই হচ্ছে শিক্ষিত জনের মুখে ব্যবহৃত মান ভাষা (Standard Colloquial Bengali) যা সবরকম লেখায়ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিচের উদাহরণে সাধু ও চলিত ভাষার ব্যবহার দেখুন:

সাধু ভাষার উদাহরণ

"তাহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম।" –ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

চলিত ভাষার উদাহরণ

"পুরানা পল্টনের যে জিনিসটি আমি কখনো ভুলবো না, তা হচ্ছে তার বার্ষার রূপ। অমন ধ্বনি-বর্ণ বহুল, উচ্ছৃঙ্খল, অজস্র বর্ষা আর দেখতে পারবো না।" –বুদ্ধদেব বসু

সাধু ও চলিত ভাষারীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য

সাধু ভাষা		চলিত ভাষা	
ক.	সাধু ভাষা নির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসারী।	ক.	চলিত ভাষায় ব্যাকরণের নিয়ম কিছুটা শিথিল।
খ.	সাধু রীতির কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তণীয়।	খ.	এ ভাষা প্রবাহমান ও বিচিত্রিত তাই এর কাঠামো পরিবর্তনশীল।
গ.	এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট। এর বাক্যের শব্দ বিন্যাসে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার একটি বিশেষ ক্রম অনুসরণ করা হয়।	গ.	এর বাক্য কাঠামোতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে স্বাধীনতা রয়েছে, ফলে এ ভাষার প্রাণশক্তি বেশি।
ঘ.	সাধু ভাষা এক প্রকার আভিজাত্য ও কৃত্রিম গাম্ভীর্যের অধিকারী।	ঘ.	চলিত ভাষা কৃত্রিমতা বর্জিত। এ ভাষা মানুষের মনোভাব প্রকাশের জন্য অত্যন্ত প্রশস্ত।
ঙ.	এ ভাষা নাটকের সংলাপ, আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতা-বিতর্কের জন্য খুব বেশি উপযোগী নয়।	ঙ.	এ ভাষা বক্তৃতা-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা ও নাটকের সংলাপের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি উপযোগী।
চ.	সাধু ভাষায় ক্রিয়া ও সর্বনাম পদ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়।	চ.	চলিত ভাষায় ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়।
ছ.	এ ভাষায় তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার বেশি।	ছ.	এ ভাষায় তদ্ভব ও দেশি শব্দের ব্যবহার বেশি।
জ.	চলিত ও আঞ্চলিক ভাষা থেকে গৃহিত পদ এ ভাষায় পরিহার করার চেষ্টা করা হয়।	জ.	এ ভাষা খাঁটি দেশজ সংস্কারের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে।
ঝ.	শিখে আয়ত্ত করতে হয় বলে চেষ্টা করলে সবার পক্ষে সাধু ভাষা কিছুটা আয়ত্ত করা সম্ভব।	ঝ.	চলিত ভাষার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাতে হয়। তা না হলে এর ব্যবহারে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব আসে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে ক বৃত্তায়িত করুন:

১. লিখিত ভাষার উদ্ভব কেন হয়েছিল?
ক. প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য
খ. ভাষাকে শিল্পরসে সমৃদ্ধ করার জন্য
গ. ভাষার স্থায়ী প্রয়োজন মেটাবার জন্য
ঘ. মনের সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ ঘটাবার জন্য।

২. বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে কোন ভাষা মিশে আছে?
ক. মৌখিক ভাষা
খ. আঞ্চলিক ভাষা
গ. সাধু ভাষা
ঘ. চলিত ভাষা।

৩. চলিত ভাষা—
ক. প্রকৃতি থেকে আসা একটি সর্বজনীন ভাষা
খ. কেবল মৌখিক প্রয়োজন মেটাবার ভাষা
গ. একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষার মার্জিত রূপ
ঘ. লিখিত ও মৌখিক উভয় রূপে ব্যবহার করার ভাষা।

৪. মানুষের মুখের ও লেখার ভাষার মধ্যে পার্থক্যের সূচনা হয়—
ক. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে
খ. 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পর থেকে
গ. ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব থেকে
ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য রচনার পর থেকে।

৫. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়েছিল—
ক. বাংলা গদ্য সাহিত্যের চর্চা করার জন্য
খ. ইংরেজ কর্মচারীদেরকে বাংলা শেখাবার জন্য
গ. বাংলা ভাষীদের ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য
ঘ. বাংলা ভাষী লেখকদের লেখা গ্রন্থ পড়াবার জন্য।

৬. চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বেশি সংগ্রাম করেছিলেন কে?
ক. প্রমথ চৌধুরী
খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. কালী প্রসন্ন সিংহ
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মৌখিক বা কথ্য রূপ বলতে কী বোঝেন? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

২. আঞ্চলিক ভাষা কাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণ দিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

২. স্পর্শবর্ণ কাকে বলে? স্পর্শবর্ণগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কী কী?

৩. উৎপত্তি অনুসারে শব্দকে কত ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী? প্রত্যেকটি ভাগের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দিন।

৪. গঠন অনুসারে শব্দকে কত ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী? প্রত্যেকটি ভাগের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দিন।

৫. অর্থভেদে শব্দকে কত ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী? প্রত্যেকটি ভাগের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দিন।

৬. একটি সার্থক বাক্যের গুণ কয়টি এবং কী কী? বিশ্লেষণ করুন।

৭. গঠনের দিক দিয়ে বাক্যকে কত ভাগে ভাগ করা যায়? সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দিন।

৮. সাধু ও চলিত ভাষারীতির উদ্ভব ও বিকাশের বর্ণনা দিন।

৯. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিরূপণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

১. ঘ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

১. গ ২. খ ৩. খ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১.৫

১. গ ২. খ ৩. ঘ ৪. ক ৫. খ ৬. ক